সতীনাথ ভাদুড়ীর কয়েকটি ছোটগল্প একটি সময়ের অভিজ্ঞতা

শ্রাবনী পাল

সতীনাথ ভাদুড়ী-র (১৯০৬ -১৯৬৫) জন্মভূমি - বাসভূমি অধুনা বিহার - ভুক্ত পূর্ণিয়া। এইখানেই তাঁর উদ্যানচর্চা এবং সাহিত্যচর্চ। এমন বলা যেতেই পারে, তাঁর আন্তরিক পরিচর্যায় বসতবাড়ির বাগানে যে ফুলগুলি ফুটেছিল, কালের অনিবার্য নিয়মেই তা' ঝরে গিয়েছে; কিন্তু তাঁর লেখনী সাহিত্যের কাননে যে ফুলগুলি ফুটিয়েছিল কালের অমোঘ মিয়মকে পরিহাস করেই যে তা অম্লান হয়ে রয়েছে। এইখানেই মানুষের জয়, এইখানেই মানুষের মহিমা--- শিল্প সৃষ্টির জয়।
সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসের সংখ্যা ছয়, গল্পের সংখ্যা সাকুল্যে বাষট্টি, 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' কিংবা ডায়েরির মতো গদ্য - রচনার সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। তবু তিনি চিহিত হলেন 'লেখকের লেখক' বলে। পূর্ণিয়া এবং পূর্ণিয়ার মানুষজন তাঁর বিভিন্ন লেখার বিষয়ও চরিত্র হতে পারে, তবু সতীনাথ 'আঞ্চলিক' লেখক নন; মনুষ্যত্বের সন্ধানেই তাঁর মহতী অভিযাত্রা। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জাগরী' (১৯৪৫) সাড়া জাগিয়েছিল, নাড়া দিয়েছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবী পাঠককে, তারপর থেকে যে সময়টুকু লিখেছেন পাঠককে সেইসময়ে যুগপৎ উৎকর্ণ ও মনোযোগী থাকতে হয়েছে।
কবিকে তাঁর জীবনচরিতে পাওয়া যাবে না, এমন অভিমতের পাশাপাশি তাঁর রচনার যথার্থ অনুধাবনের জন্য রচয়িতার জীবনপঞ্জি প্রয়োজন, এমন ধারণাও প্রচলিত। সতীনাথ অন্য এক কথাশিল্পী সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে একবার বলেছিলেন, "লেখা থেকে লেখকের ব্যক্তিগত চরিত্র বা চি সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া ভুল।" এমনও কেউ বলেছিলেন, "সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যক্তিকে প্রক্ষেপণের নীতিতে সতীনাথের আস্থা ছিল না বলে মনে হয়।...সতীনাথের সমগ্র কথা - সাহিত্যে যে প্রখর বিষয় প্রাধান্যের সমাবেশ দেখতেপাওয়া যায় তা লেখকের নিরাসক্ত মনেরই পরিচায়ক। কথাসাহিত্যিক যদি ব্যক্তিগত আশা নৈরাশ্যের দ্বারা উদ্বেলিত হন তবে তাঁর শিল্পভাবনা ব্যাহত হতে বাধ্য।" (দ্র. সতীনাথের ছোটগল্প ঃ শচীন বিশ্বাস, 'সতীনাথ - স্মরণে', ১৯৭২) ঠিকই, কিন্তু একালের কোনো 'সৎ'- লেখা থেকে লেখকের জীবনচর্যা - মতবাদ - বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কোনো চিহ্ন একেবারেই পাওয়া যাবে না, এতটাই বিশ্বাস, করতে আমাদের কষ্ট হয়। তাই সতীনাথের জীবনাচরণে তাঁর সাহিত্যভাবনা কয়েকটি সূত্র - সন্ধান নিরর্থক হয় না, এদিক থেকেই হয়তো সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প তাঁর 'অভিজ্ঞতা' -- দেশমন্থিত কালপ্রেরিত অভিজ্ঞতা এবং তার শিল্পিত রূপায়ণ। অর্থাৎ আলোচ্য প্রবন্ধের সীমানায় আমরা সেইসব গল্পগুলির কয়েকটি নির্বাচন করে নেব, যেখানে সতীনাথের নিজস্ব জীবনজিজ্ঞাসা প্রতিধবনিত হয়েছে, যেখানে সতীনাথের চারপাশের সময় ও সমাজ তাঁর লেখার 'বিষয়' হয়েছে।
শিক্ষিত কৃতবিদ্য সচ্ছল পরিবারে সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম, পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, পূর্ণিয়ায় প্র্যাক্‌টিশ করেন। পূর্ণিয়া তখন বাংলার বাইরে নয়, বিহার - উড়িষ্যা যখন পৃথক প্রদেশরূপে গড়ে ওঠে ১৯১১ সালে, তখন থেকেই বাংলার ক্রোড়চ্যুত পূর্ণিয়া বিহারের অন্তর্ভূক্ত হয়। নগর কলকাতার কোলাহলক্লিষ্ট কৃত্রিম জীবনযাপন থেকে অনেক দূরে পূর্ণিয়ার সাধারণ মানুষের উত্তেজনাহীন অনায়াস বেঁচে - থাকার মধ্যে আজীবন থেকেছেন সতীনাথ। ফলে তাঁর লেখায় এইসব মানুষেরই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। এদিক থেকেও সতীনাথ যেমন সত্যনিষ্ঠ, তেমনই সেই অভিজ্ঞতার রূপায়ণ তাঁর সাহিত্যে। মেধাবী ছাত্র সতীনাথ ১৯১৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক বৃত্তি লাভ করে পূর্ণিয়া জেলাস্কুলে ভরতি হন। ১৯২৪ -এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ডিভিশনাল স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেন এবং পাটনায় পড়তে যান। আই. এস. সি-র

পর অর্থনীতিতে অনার্স (১৯২৮) ও পরে এম. এ. (১৯৩০) পাশ করেন। বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র সতীনাথ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তেমন সফল হননি, পাশ করেছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এর মধ্যে তাঁর মা রাজবালা দেবীর মৃত্যু (৪ এপ্রিল, ১৯২৮) এবং তার একসপ্তাহের মধ্যেই বড়বোন কণাময়ীর আকস্মিক মৃত্যু (১০ এপ্রিল ১৯২৮) সতীনাথকে স্তম্ভিত করে দেয়। বিশেষত আত্মমগ্ন অন্তর্মুখী সতীনাথ মায়ের মৃত্যুতে ক্রমশ এক বিষাদের মধ্যে ডুবে যেতে থাকেন, একাকিত্বের ছায়া তাঁর জীবনে ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। এম. এ. পরীক্ষায় আশানুরূপ ফললাভে ব্যর্থতার জন্য এই মৃত্যুর প্রভাব আছে হয়তো। একটা নিঃসঙ্গতাবোধ উদাসীনতা ধীরে ধীরে ঘিরে ধরেছে তাঁকে। এর মধ্যেই পাটনা ল' কলেজে আইন পড়া এবং ১৯৩১-এ বি. এল উপাধি লাভ।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ - এর ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পূর্ণিয়া কোর্টে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের জুনিয়র হিসেবে ওকালতি করলেনসতীনাথ। পিতৃসূত্রে সুযোগ ছিল, নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ছিল; কিন্তু ওকালতিতে সতীনাথের মন ছিল না, সকালে আইনের বই পড়তেন তন্ন তন্ন করে, সকাল ন'টা থেকে বারোটা 'দাদামশাই' কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সাহিত্যিক আড্ডায় নিয়মিত যোগদান, বাড়িফিরে মধ্যাহ্ন ভোজন বিশ্রাম - সংবাদপত্র পাঠ, সান্ধ্যভ্রমণ, রাত ন'টা পর্যন্ত স্টেশন ক্লাবে টেনিস খেলা, রাতে নিজের ঘরে নিভৃতে সাহিত্যচর্চা--- এই তাঁর সেইসময়কার 'Daily routine'। "এ ছাড়া বাহাদুরি আর বাহবা নেবার জন্য, কতকগুলি public activity দেখাচ্ছি। টুলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সেরেছি। একটা public trust fund দেখবার এখানকার লোকেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছি। পুজোয় বলি তুলে দেবার জন্য mass meeting আহ্বান করচি। বাড়ি এসে নিজেরই হাসি আছে এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার জন্য..." (বন্ধু বিভুবিলাস ভৌমিককে লেখা চিঠি) অথচ মনে পড়বে ১৯৩০ - ৩২ এদেশে লবণ সত্যাগ্রহের কাল, ভারতবর্ষ তখন আন্দোলনে উত্তাল; কিন্তু সেইসময়ে অন্তত বাহ্যত রাজনীতিতে উৎসাহ দেখা যায়নি সতীনাথের। 'ইংলন্ডে গান্ধীজি' (ভাদ্র ১৩৩৮ - নবশক্তি) বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, মদের দোকানে পিকেটিং করেছেন কিংবা ১৯৩৫ - এ পূর্ণিয়ায় যে মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছিল মূলত তাঁরই উদ্যোগে, তার মধ্যে দিয়ে সতীনাথের সমাজসচেতন মনের পরিচয় পাওয়া গেছে এই পর্যন্ত। আবার হয়তো এইসময়েই নানা ভাঙাগড়া চলছে তাঁর মনের মধ্যে --- ওকালতি তাঁর ক্ষেত্র নয় একটু বুঝতে পেরেছিলেন, প্রাত্যহিক সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে খুলে গিয়েছিল অন্য এক জগতের দ্বার, আর সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে হয়তো খুঁজতে চেয়েছিলেন জীবনের অন্য কোনো অর্থ, হয়তো ভাবছিলেন এ জীবন লইয়া কি করিব কি করিতে হয়!' অন্তর্মুখী সেই মনের ভাবনা টের পায়নি কেউই, শুধু ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ - এ সকলে শুনল 'সতীনাথ পূর্ণিয়া কংগ্রেসের সম্মানিত নেতা --- পরে সর্বপূজ্য সর্বোদয় নেতা --- বৈদ্যনাথ চৌধুরীর টিকাপট্টি আশ্রমে যোগদান করেছেন।' 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' - তে সতীনাথ লিখেছিলেন 'মানুষকে সে ভালোবাসত। তার কাজে প্রেরণা যোগাত তার আশাবাদী মন।... তার ভাবপ্রবণ মনে একটা আদর্শবাদিতার মোহ জন্মেছিল ছোটবেলাতেই। এর প্রাবল্যে সংসার ধর্ম করবার কথা তার মনের কোণায় উঁকিঝুঁকি মারবার পর্যন্ত সুযোগ পায়নি।' বরং মন চেয়েছিল জীবনে জীবন যোগ করে মানুষকে ভালোবেসে মানুষের পাশে দাঁড়াতে। তাই পূর্ণ যৌবনে রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর ব্রতগ্রহণ। দাদামশায় ঠিকই বলেছিলেনন 'ওরূপ intellect -এর ছেলে চাকরি কি court attend করতে উৎসাহ পায় না। তারা বরাবরই বড় aspiration পোষণ করে, সাধারণে যা করে তাতে মন বসে না।' তাঁর আরো মনে হয়েছিল, সে '....adopt করে নেবার শক্তি নিশ্চয়ই রাখে। Risk না নিলে কোনো বড় কাজ হয় না।' সতীনাথ 'adopt' পুরোপুরিই করেছিলেন, 'risk' নিয়ে ভুল যে করেননি, তাঁর সাহিত্য তার প্রমাণ। আপাত - সুখী সচ্ছল ভদ্রলোকের জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে সতীনাথ দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের চলার পথে পা রাখলেন --- গ্রামের গ্রামান্তরে কখনো পায়ে হেঁটে কখনো গোর গাড়িতে কখনো পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে ঘুরছেন সতীনাথ --- কংগ্রেস কর্মীদের শিক্ষাদানে, জেলা কংগ্রেস কমিটির কাজে, সংগঠনে, পরিচালনায় সতীনাথ তখন খুবই ব্যস্ত। কংগ্রেস তখন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে গেছে, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পর্ব শু হয়েছে, আবার শু হয়েছে বিয়াল্লিশের আন্দোলন, গোপন সংগ্রাম। ঘরে বাইরে সেদিন একশ্বাসরোধী উত্তেজনা। এরই মাঝে বিচক্ষণ স্বল্পভাষী সত্যপ্রিয় সংকল্পে কঠোর এই মানুষটি নীরবে কাজ করে চলেছেন।১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ -এর মধ্যে সতীনাথ কারাদ্ধ হয়েছে তিনবার--- প্রথমবার ১৯৪০-এ জানুয়ারিতে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য, প্রথমে পূর্ণিয়া পরে হাজারিবাগ জেলে বন্দী ছিলেন কিছুদিন। দ্বিতীয়বার ১৯৪২ -এর আগস্ট আন্দোলনে ধরা পড়েন, প

াঠানো হয় তাঁকে পূর্ণিয়া জেলে, তারপর ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে। ১৯৪৪ -এ মুক্তি পেয়ে আবার তুলে নেন কর্তব্যের ভ ার। ঐ বছরেই তৃতীয়বার কারাবাস করতে হয় তাঁকে। এই কারাবাস সতীনাথকে ভিতরে ভিতরে তৈরি করেছে, প্রত্যক্ষ এই অভিজ্ঞতা ভিন্ন 'জাগরী' লেখা সম্ভব হতো কি না, সে প্র থাকেই। তারপর ১৯৪৭ -এ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর সতীনাথ কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেন, তখনো তিনি পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি। এর মাসতিনের পর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন সতীনাথ, কিন্তু সেখানেও বেশিদিন থাকতে পারেননি। সচ্ছলতার সম াদর - সম্মান ছেড়ে তিনি কে কৃচ্ছ্রসাধন করলেন রাজনৈতিক জীবনে, কেন বেছে নিয়েছিলেন এই পথ; একথার স্পষ্ট ও সৎ উত্তর সতীনাথ দেননি। তেমনই কেন তিনি রাজনীতি ছাড়লেন তারও উত্তর মেলেনি যথাযথ।একবার বলেছিলেন, 'কংগ্রেসের কাজ স্বাধীনতা লাভ করা ছিল, সে কাজ তো হাসিল হয়ে গিয়েছে। এখন রাজকাজ ছাড়া কোনো কাজ নেই অ ার।' স্পষ্ট করে বলেননি, কী এই রাজকার্য--- Unfinished revolution না, revolution betrayed. জমে-থাকায় কথ ার অভিব্যক্তি ঘটেছিল আর - একবার, 'সংকট' -এর ঝিাসজী-র কথায়---

''যতকাল চলল চালালাম। আর চলল না। এতে প্রত্যেক মুহূর্তটা এমন কাজের ঠাসবুনুনি ভরা যে শেষপর্যন্ত এ সবের ম ানেটা পর্যন্ত হারিয়ে যায়। একাজ থেকে পরের কাজ, তার পরের কাজ - সব মুহূর্তগুলো একরকম। সবগুলো সমান ক াজের হলে কোনটা ছোট কোনটা বড় মুহূর্ত বুঝবে কি করে? নমস্কার করছ, হেসে কথা বলছ, --ভয় দেখাচ্ছ, আশ্বাস দিচ্ছ, সবগুলো একরকম। তোমার ---টাইপরাইটারটার-এ যেমন ঠক্‌ঠক্‌ একটা অক্ষরের পর একটা অক্ষরের ছাপ পড়ে সেই রকম। কাজের চিঠিতে যেমন অকাজের চিঠিতেও তেমন। সবসময় এক রকম। আর চলল না।'

দিনানুদৈনিক গতানুগতিকতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে চোখের সামনে আত্মার অপমৃত্যু দেখে দেখে যন্ত্রণা পেতে চ াননি সতীনাথ। বরং এই পর্বে অচেনাকে চিনে চিনে তাঁর জীবন ভরে উঠল। সাহিত্যে এই ভাবনারই ছায়া পড়ল। জাগরী, ঢোঁড়াই চরিত মানস, চিত্রগুপ্তের ফাইল, সংকট ইত্যাদি উপন্যাসে, 'গণনায়ক', 'চরণদাস এম. এল.এ', 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ' এইরকম কিছু গল্পে রাজনীতির অশুভ দিকটির ছবিই ধরা পড়েছে। এইদিক থেকেই মনে হয়, সতীনাথের বহু রচনাতেই কোনো না- কোনভাবে এই জীবনের অভিজ্ঞতা মুদ্রিত হয়ে আছে। বস্তুত, রাজনীতির দেশসেবার সদর্থক দিকটি যেমন সতীনাথকে প্রবুদ্ধ করেছিল, ভিতরকার ফাঁকির দিকটিও তেমনই তাঁকে ব্যথিত করেছিল। সেই ফাঁকিটুকু নিজের ক াছে অসহ্য মনে হয়েছিল বলেই সম্ভবত সতীনাথ রাজনীতির সংস্রব পরিহার করেছিলেন। কিন্তু মানসিক সেই অস্থিরতা থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাননি, তারই প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যে। কোথাও সেই অভিজ্ঞতা বাইরের বস্তু, উল্লেখেই শেষ, কিন্তু কোথাও ভাষায় ভাবে আচরণ - রীতির বৈশিষ্ট্যে তা লক্ষণীয়। কোথাও শুধু বাইরে নয়, মনোভুবনেরও 'সরস মৃদু ব্যঙ্গের রূপায়ণে তার প্রকাশ।' গোপাল হালদার এ প্রসঙ্গে বলেছেন---

''....সাহিত্যে তাঁর আর্ট realist art, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। কিন্তু অভিজ্ঞতা তো শুধু বাহ্য ঘটনা নয়, অভিজ্ঞতার অর্থই হল বাহ্যকে, তথ্যকে অন্তরের বস্তুতে পরিণত করা--- experience is not what happens to one but what one makes of it. ঘটনার অবলোকন ও অঙ্গীকার (internalization) --- তাতেই fact হয়ে শিল্পে পরিণত হয়ে ওঠে। নিছক তথ্য অভিজ্ঞতা নয়। না বললেও চলে তথ্যের দৃষ্টি সতীনাথের অসামান্য, কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় না। সেই তথ্য internalized হয়ে তাঁর শিল্পসাধনার্য জীবন - সাধনার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে প্রাণবন্ত হয়ে গিয়েছে, তবু external তথ্য তা লিকায় বিষয় নেই, তবে তথ্যই তার substrata তার সতীনাথের সেই খুঁটিনাটিতে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি....'' সতীনাথের কথাস াহিত্য তাই স্বতন্ত্র আবহ তৈরি করেছে, আর দেশকালের প্রক্ষেপেই এই স্বতন্ত্রতা তৈরি হয়েছে।

সতীনাথের নির্বাচিত কিছু গল্পের আলোচনায় প্রবেশের আগে আমরা একবার দেখে নিতে পারি সেই সময়ের মুখটুকু। মহ াত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় দেখতে দেখতে সতীনাথের যৌবন কাটছিল। পূর্ণিয়ায় সম্ভ্রান্ত সচ্ছলজীবনধারার অংশীদার হয়েও সতীনাথ সাধারণ মানুষগুলোর জীবনযাপনকে ছুঁতে চেয়েছিলেন। সমাজকল্য াণমূলক কার্যকলাপে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ লক্ষ্য করার মতো। ১৯৩৯ -এর সেপ্টেম্বরের শেষে, দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ তখন তেমন উত্তপ্ত নয়, তবে দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধের ছায়া ঘন হতে শু করেছে সেপ্টেম্বর হিটলারের পোল্যান্ডআক্রমণে-- - সেইসময়েই সতীনাথ গ্রহণ করলেন রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর ব্রত। ১৯৪২ -এ আন্দোলনের কালে পূর্ণিয়া জেলার সংগঠনের ভার গোপনে ন্যস্ত হয়েছিল সতীনাথের উপর। বিপুল অর্থের হিসাব, রিভলবার আনা নেওয়া ও সকলের সঙ্গে

যোগাযোগ রাখা কাজ ছিল তাঁর দেশব্যাপী আগস্ট আন্দোলন সেদিন এক উন্মাদনা তৈরি করেছিল। আর কিছু পরে পঞ্চাশের মন্বন্তর(১৯৪৩), দক্ষিণ - পূর্ব এশীয় রণক্ষেত্রে যুদ্ধ - আয়োজনের মরূপে কলকাতা ও বাংলাকে ব্যবহার (১৯৪১-৪৫), হিন্দু - মুসলমান দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশবিভাগ, স্বাধীনতা ও উদ্বাস্তু সমস্যা (১৯৪৭-৫০) --- এইসব সংকটেরমধ্যে দিয়ে মানুষকে তখন চলতে হয়েছে। স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত একটা লক্ষ্য ছিল, দেখা গেল সেই উদ্দেশ্যপূরণের পর লক্ষ্যবিন্দু আবার পরিবর্তিত হয়েছে। বিদেশীর ক্ষমতার অবসান ঘটল কিংবা সেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল দেশীয় নেতাদের উপর, তারপর দেশের মধ্যে চলল ক্ষমতার বিন্যাস, পুনর্বিন্যাস। লোভী সুবিধাবাদী মুনাফাখোর একদল মানুষ চলে এলো পুরোভাগে। এদের আত্মকেন্দ্রিক নির্লজ্জ মুখের ছবিটা অনায়াসে চিনে নিলে সংবেদী লেখক, চিনতে পারল না ভারতবর্ষের অগণিত সাধারণ অশিক্ষিত যুগপৎ সরল মানুষ।তারা ক্রমশ ঐ পরোপকারের মুখোশধারীদের হাতের পুতুল হয়ে গেল, তারপর চলল তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন 'নৃত্য'। সতীনাথ এই 'পুতুলনাচ' মেনে নিতে পারলেন না। রাজনৈতিক দলাদলির, স্বার্থপরতা, নীচতায় আহত হয়ে আদর্শবাদী সতীনাথ তাই দেশ স্বাধীন হবারপরেই রাজনীতির মঞ্চ থেকে নিশ্চান্ত হলেন। দেশভাগের পটভূমিতেই একমাত্র সম্ভব হতে পারে 'গণনায়ক' -এর মতো গল্প, সতীনাথের অন্তর্দৃষ্টি সেই গল্পকে শিল্পসার্থকও করে তোলে। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তিনি নির্মম বিদ্রূপে বিদ্ধ করেন তাঁদের, এসব গল্প তাই কৌতুকের পাশাপাশি বেদনারও।

'গণনায়ক' (দৈনিক কৃষক, শারদীয়, ১৩৫৪) ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের সময়কার লেখা। পূর্ণিয়ার একটা বর্ডারে হিন্দু - মুসলমান দু'সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী দেশভাগের অনিশ্চয়তা আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ খুঁজে নিচ্ছে, সেই স্বার্থেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে, জননায়ক হিসেবে বিস্তার করতে চাইছে নিজেকে, আবার ছড়িয়ে দিচ্ছে কালোবাজার ও নিজেদের মুনাফার রাজত্ব। সুধানী - গোলার জহুরমল ডোকানিয়ার 'মুনীম' শহর থেকে 'খবর' আর চিনির বস্তা নিয়ে আয়াখোলার হাটে যাচ্ছেন। গোপালপুর থানার আয়াখোলার হাট জমে উঠেছে যুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির দৌলতে --- বিহার আর বাংলার মধ্যে বেআইনি জিনিসের কেনাবেচায়। হিন্দু - মুসলমানের মিশ্রিত জনসংখ্যা, গতবছরের (১৯৪৬) কলকাতা নোয়াখালির দাঙ্গা এখানকার মানুষগুলোর মধ্যে রেখাপাত করেছিল, কিন্তু কালের স্রোতে কিছুটা ম্লান হয়েও এসেছিল সেই শঙ্কা, 'কিন্তু সেই পুরনো ফাটল দিয়ে ভাঙন ধরল হঠাৎ।' 'দিনাজপুর জেলা তো পাকিস্তান হয়ে গেল' কিংবা 'মালদা জেলা পড়েছে পাকিস্তানে' অথবা '....জলপাইগুড়ি জেলার জন্য চিন্তাকরবেন না। ....ওটা হিন্দুস্থানে পড়েছে।' ---এই বাক্যগুলির উদ্দেশ্য বিধেয় ক্রিয়া কর্ম শুধু কতকগুলি শব্দের ওপর নির্ভর করে না, এইকৌতূহল আর উৎকণ্ঠা দর্পণ সিং-অছিমদ্দী - পোড়াগোঁসাইয়ের বুকের অনেক গভীর থেকে উঠে এসেছে।'ভগবান এ তুমি আমার কী করলে --- শেষকালে মরলে কবরে যেতে হবে।' কিংবা পাটের ক্ষেতে লুকিয়ে থাকা অছিমদ্দীর আকুল কান্না 'গাঁ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলাম হরিপুরের দিকে। মীরপুর হিন্দুস্থান হয়ে গিয়েছে পরশু থেকে, শুনছি পূর্বদিকে মুখ করিয়ে নামাজ পড়াবে। মুরগী জবাই করতে দেবে না। তাই এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছি...' নিছকই কেবল আবেগকম্পিত উচচারণ নয়, এ সেইসব মানুষের অনুভব, অভিজ্ঞতা। আর তাতেই মূলধন করে হিসেব কষে ত্রিবেদী --- হাট থেকে চাঁদা তুলে কমিশনকে দিলে তার রায় পুনর্বিবেচিত হতে পারে, এমনই আশায় মুনীমজী ভাবেন---

''তাঁর হিসাবে ভুল হয় না। এখন চাঁদা তুলে যা লাভের সম্ভাবনা, তার অনুপাতে বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশী। এক করলেহয় একটি জিনিস -- চাঁদা তুলে চুপচাপ থাকো, যদি পাকিস্তানে যায় জায়গাটা তাহলে টাকা ফেরৎ দেওয়া যাবে, বলা যাবে যে বাকিদের ঘুষ খাওয়ানো গেল না; আর যদি পাকিস্তানে না যায়, তা হলে টাকাটা নিয়ে বললেই হবে যে কমিশনকে খাইয়েছিলাম। --না, দরকার কি ঝঞ্ঝাটে। যার রয় সয় তাই ভালো----

নাগর নদীর পুল পার হয়ে দিনরাত লোক আসছে শ্রীপুরের দিক থেকে, হাঁড়িকুড়ি গ ছাগল বিড়াল নিয়ে, অনিদিষ্ট লক্ষ্যনিয়ে। তারা ভীত উদ্বিগ্ন যেমন, তেমনই তাদের বিদ্বেষ ---'চ্যালাকাঠ দিয়ে আসবার সময় উনুনটা ভেঙে দিয়ে এলাম, ---কি সুন্দর আরঝকঝকে তকতকে উনুনটা তুলেছিলাম, ---তাতে রাঁধবে কি না আরফানের চাচী, ---আর যে জিনিস রাঁধবার নয় সেই সব জিনিস!' সতীনাথ দেখেন, দেখান বানিয়ে তোলা গুজবে কিভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, আর সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে 'সাচচা আদমী' মুনীমজী। বেহ্মদত্যি' আর 'মামদো ভূত' - এর খেলা শিখেছে ছেলেরা, 'নোয়াখালিতে মরলে হবে বেহ্মদত্যি, বিহারে মরলে হবে মামদো!' রিলিফ ক্যাম্পের

বাবুরা এই খেলা শিখিয়ে হয়তো মজা করছে, কিন্তু সেখানেও মুনীমজীর কড়া নজর, 'দায়িত্বশীল' মুনীমজী এ- খেলা চলতে দেন না। স্বাধীনতা আসে পনেরই আগস্ট, পুলের এপারে হিন্দুস্থানের পতাকা, ওপারে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা। এত উৎসব - কোলাহলের মধ্যে, পুলের এপারে হিন্দুস্থানের পতাকা, ওপারে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা। এত উৎসব - কোলাহলের মধ্যেও দর্পন সিঙের মন পড়ে থাকে নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্য। সেই আশায় কখনো মনে হয় কে বড়? 'কমিশন কি ভগবানের চাইতেও বড়'? একবালের মতো সাধারণ মানুষও ভাবে, অভিমান করবে কার উপর, দুনিয়া যখন পিছনে লেগেছে--- আপাত- নির্লিপ্ত হানিফেরাও একবার মনে হয় আধ - খাওয়া বিড়িটার আগুন থেকে যদি পুলে আগুন লাগে তবে বেশ হয় --- আয়াখোলা আর শ্রীর আলাদা হয়ে যাবে তাহলে---

আর মুনীমজী তাঁরই দেওয়া পাকিস্তানি ফ্ল্যাগগুলো জমা করতে থাকে, সেগুলো বেচবেন তিতলিয়ায়, সেখান থেকে জোগাড়করে নেবেন হিন্দুস্থানের পতাকাগুলি। একই জিনিস দু'দুবার করে বেচবেন, এই কমিশনের সুযোগ তাঁকে দিয়েছে কমিশন। ক্যাম্পের বাইরে এই গণনায়কের নাম জয়ধবনি ওঠে আর মুনীমজী একবার ভাবেন---'একটি খদ্দরের টুপি আগেই কিনে রাখলে, বোধহয় আর একটু সুবিধে হত---হয়তো হিসেবে একটু সুবিধে হত--' ...."

বলা বাহুল্য, বাংলা ছোটগল্পে 'গণনায়ক' একেবারেই স্বতন্ত্র সংযোজন। দেশকাল এ গল্পে যে - পটভূমি তৈরি করেছে, তার ধারণা ব্যতিরেকে এ গল্প তৈরি হতে পারে না। দেশভাগের বেদনায় অনেক অনুভূতিপ্রবণ গল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু সতীনাথ শুধু সেই আকুলতার গল্প লিখতে চাননি, দেখিয়েছেন সাধারণ 'অশিক্ষিত' মানুষগুলির অনুভূতি নিয়ে কী অসাধারণ কৌশলে পরিত্রাতার ভূমিকায় 'অবতীর্ণ' হলেন মুনীমজী। কমিশনের রায় বেরোনোর আগেই ছড়ানো গুজবে লাভবান হয় মুনীমজী। এ'সব দর্পন সিংরা তো মহাত্ম গান্ধীকে চেনে না, মুনীমজীকে চেনে, সে -ই ভারতবর্ষের লাটসাহেবের কমিশনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এবং এক অর্থে সত্যই সে 'জনগন - মন - অধিনায়ক', পরিস্থিতির সুযোগে জনমানসের প্রবণতা বুঝেই সে ফাট্কা খেলেছে জিলার সম্বন্ধেই সত্য।' দেশের পতাকা নিয়ে ব্যবসা--- এই 'ট্রাজিক ফার্স কী কদর্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেছে তা গল্পটিতে স্পষ্ট - পরে তা সহস্রগুণে বাস্তব সত্য হয়ে উঠবে। এইখানেই সতীনাথের জীবনদৃষ্টি সমাজবীক্ষার গভীরতা --- জনহিতের পরিবর্তে আত্মপরায়ণতার চূড়ান্ত আর নির্লজ্জ প্রকাশে ব্যথিত গল্পকারের ক্ষোভ - বিদ্রূপ সমকালকে বিদ্ধ করে চিরকালকে স্পর্শ করে গেল। বোঝা যায় 'স্বাধীন' ভারতবর্ষের 'গণনায়কে'র চেহারা অনুধাবনে গল্পকার কতটা দূরদর্শী।

এইরকমই একটি গল্প 'চরণদাস এম. এল. এ' (দেশ, শারদীয় ১৩৬৮)। স্বাধীন দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে সতীনাথ নির্মম স্যাটায়ার করেছেন। ক্ষমতা এম. এল. এ- কে কী দিয়েছে, আর কী কেড়ে নিয়েছে, লেখক এখানে তার নিরাসক্ত দ্রষ্টা। চরণদাস নামটিই এখানে তাঁর তীব্র বিদ্রূপের লক্ষ্য।

"মা-বাপের কাছ থেকে পাওয়া নাম চরণ দাস। একসময় লোকে ভালোবেসে ডাকত চরণদাসজী বলে। পরিস্থিতি বদলেছে।আজকাল সরকারি দপ্তরে তাঁর নাম শ্রীচরণ দাস, এম. এল. এ। সাধারণ লোকের মধ্যে যারা নিজেদের ইংরাজি জানা ভাবে, তারা আজকাল ডাকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহেব বলে; আর যাদের ইংরাজি জানাবার কোনরকম দাবি নাই তারা ডাকে মায়লে - জী বলে। এই উচচারণ - বিকৃতি কোনরকম দুরভিসন্ধিজাত নয়।"

এই শেষ বাক্যবন্ধটিই মারাত্মক, কেননা তা 'দুরভিসন্ধিজাত'। সাধারণ মানুষ তথা 'ভোটার'দের দৃষ্টিকোণ থেকে চরণদাসের মতো নেতাদের ছবি এঁকেছেন লেখক। 'হাইকমান্ড' নামক খামখেয়ালি প্রতাপশালী 'ভগবানে'র আদেশ---জনসংযোগ যার কম তাকেআগামী নির্বাচনে এম. এল. এ করা হবে না। এই 'পদস্খলনে'র ভয়ে বছর চারেক পর নিজের ভোটকেন্দ্রে এসেছে চরণদাস। স্যুটকেসহোল্ড - অল নিয়ে নয়, ঝোলা আর কম্বল নিয়ে। খালি গায়ে খালি পায়ে নগরপরিক্রমায় বেরোলেন বটে, কিন্তু দেখা গেল সবার মুখে'জয় গুরু, চরণদাসকে মান্য তো কেউই করে না, পরিবর্তে বিদ্রূপ করে। রোগীর জন্য পথ্য, ছোট ছেলের জন্য বরাদ্দ গাল টেপা,আরোছোট ছেলের জন্য লজেন্স --- উপকরণ সবাই ছিল ঝোলায় কিন্তু চরণদাস বুঝলেন---

'কেউ তাঁকে বিশেষ আমল দিচ্ছে না। নিজের সুখদুঃখের কথা, দেশের অবস্থার কথা, পৃথিবীর রাজনীতির কথা...প্রত্যাশিত বিষয়গুলোর উপর কোন কথা কেউ তোলেনি। গালাগাল পর্যন্ত কেউ দিল না। কারও কি কিছু চাইবার নেই?--- 'ছেলের চাকরি, 'বস' চালাবার অনুমতিপত্র, রাস্তায় মাটির ফেলবার অধিকার, সরকারি লোন..... ?'

আরো বলছেন, " লোকে আজকাল চালাক হয়ে উঠেছে। সকলে জেনে গিয়েছে যে সরকারি অফিসাররাও আজকাল এম. এল. এ-দের কথায় কোনো গুত্ব দেয় না। " এক একবার মনে হয়, তাহলে বোধহয় সাধারণ মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে। বিশেষত তারা যেভাবে এম. এল. এ সাহেবকে পরিহাস করেছে, তাতে কিছুটা 'আতিশয্য' থাকলেও সাত আছে। এই 'ভোটার' শব্দটির লুকোনো জাদুই তো চরণদাসের সম্বল, তাই নীরবে তাকে পরিপাক করতে হয় সব অভিযোগ। নেতার কাছে যেমন কখনো 'পাবলিক অবুঝ, জনতা খামখেয়ালি, জনসাধারণ নিমকহারাম'; তেমনই ভোটারদের কাছে এম. এল. এ কখনো ইয়েমিয়েলিয়ে, কখনো মায়লেজী। শেষপর্যন্ত অবশ্য বিমুখ ভোটারদের অনুকূল করতে ধর্মগুই সাহ ায্য নেন মায়েলেজী। শ্রীসহস্রানন্দ স্বামীজীর শরণ নিয়ে ভোট - বৈতরণী অতিক্রমণের পরিকল্পনা করে এম. এল. এ। 'ভোট ারদের বশীভূত করতে হয়েছে এ গল্প পড়তে পড়তে অনেকসময় পরশুরামের তির্যক কটাক্ষ মনে পড়ে। হয়তো বোঝা যায়, কোন্ দূরদর্শিতা থেকে সতীনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন।

আমাদের জীবনের চারপাশের জগতের যা কিছু অশুভ অসত্য বিকৃত, তাকে তীব্র স্যাটায়ারের মাধ্যমে বারবার আঘাত করেছেন সতীনাথ। হাসি - কৌতুকের অস্ত্র দিয়েই আক্রমণ করেছেন যাবতীয় দুর্নীতিকে। এইরকমই একটি গল্প 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ'।এই প্রতিষ্ঠানটি করদাতাদের, কিন্তু আইন বাঁচিয়ে প্রদেয় কর কে কত এড়িয়ে যেতে পারে এই নিয়ে চরিত্রগুলির মধ্যে চলে প্রবল প্রতিযোগিতা। মুনশী নাকছেদীলাল, মৌলবী ডাক্তার আলি, দারোগা মহতো, বাঙ্গালী মহতে া, অনোখী ঝা, পল্টন চৌধুরী, মুশিকলাল মণ্ডল, রসিকলাল মণ্ডল, রামখড়ম সিং --- এঁদের নাম, বক্তৃতা, কর্মকাণ্ড আম াদের হাসির খোরাক যোগায়, কিন্তু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটি আমূল বিদ্ধ করে। এই 'করদাতা'রা আমাদের চেনা চরিত্র, আম াদেরই প্রতিবেশী। সংঘের সভাপতি পদের জন্য বাঙ্গালী মহতোর নাম প্রস্তাব করতে উঠে দারোগা মহতো বললেন-- --"ওঁর যোগ্যতা সম্বন্ধেআমি নিঃসন্দেহ। এত বড় ওঁর মোটরগাড়ি মেরামতের কারখানা, এক বড় ওঁরমোটর পার্টস - এর দোকান কিন্তু গত এগার বছরের মধ্যে এক পয়সাও সেলস্ - ট্যাক্স দেননি গভর্নমেন্টকে। গভর্নমেন্ট চেষ্টার ত্রুটি করেনি; কিন্তু পেরে ওঠেনি ওঁর কূটবুদ্দিতে।" এ স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকের গৌরব! আর এ গল্পপাঠকের লজ্জা! মুসিকলাল মণ্ডল প্রস্তাব করেছেন রসিকলাল মণ্ডলের নাম, এর যোগ্যতাও কিছু কম নয়, বড় ব্যবসাদার বিরাট কারবার কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর কাছথেকেএক পয়সা ইনকাম ট্যাক্স আদায় করতে পারেনি গভর্নমেন্ট। লক্ষণীয়, এক মহতো অপর মহতো, এক মণ্ডল অপর মণ্ডলের নাম প্রস্তাব করেছেন। লেখক যে রাজ্যের অধিবাসী, সেখানে নিজ জাতের প্রতি এই অন্ধপ্রীতি এবং অন্য জাতির প্রতি অন্ধবিদ্বেষ কী কঠিন পরিস্থিতির তৈরি করেছে তা আমাদের জানা। সতীনাথের লেখায় তারই পূর্বাভাস। তবে সবচেয়ে লজ্জাহীন মানসিকতার প্রকাশ গদিয়ান পার্টি থেকে বহিষ্কৃত রামখড়ম সিং- এর সভাপতিদের জন্য প্রার্থীরূপে অ াত্মপ্রকাশে। তিনিই যোগ্যতম প্রার্থী কেননা সম্প্রতি তিনি 'আবিষ্কার' করেছেন যে বিবাহিতের তুলনায় অবিবাহিতের প্রতি আয়কর বিভাগ বেশি অবিচার করে এবং তাই আয়কর বিভাগকে বঞ্চিত করতে তিনি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে বিবাহ করেছেন।

আমরা বুঝতে পারি কৌতুকের তলে তলে কী নির্মম ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন সতীনাথ। মনুষ্যত্বের এই অধঃপতনে ক্লান্ত ব্যথিত লেখকের বেদনা এখানে যে আত্মগোপন করে আছে। এই ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীনতা - সংগ্রামীরা? এরই জন্য তাদের এত কৃচ্ছ্র সাধন? সতীনাথেরও স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। জীবনকে, মানুষকে সমাজকে ভালোবেসেছিলেন বলেই চারপাশের বিকৃতিকে দেখে বেদনাহত লেখক তাকে কৌতুকের মোড়কে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তাঁর বিদ্রূপ কে াথাও অশালীনভাবে আঘাত করেনি। বস্তুত, সতীনাথের জীবনদৃষ্টি, সমাজভাবনা, মানবিকতার মাত্রা আলাদা।

ব্যবসায়ীদের মিথ্যাচার অসাধুতার শিকড় যে কত গভীরে যেতে পারে 'মুনাফাঠাকরণ' গল্প তার প্রমাণ। শেঠজী নানাভাবে হয়তো লোককে ঠকায় মুনাফা লাভের জন্য, কিন্তু 'শেঠজীর কেচ্ছা' নামক বইটি শেঠগৃহিণী গণেশমূর্তির পিছনে লুকিয়ে রাখতে যখন ভোলে না, যখন বোঝা যায়, কলঙ্ক চাপা দেবার উদ্দেশ্যে বইয়ের সমস্ত কপি কেনার পরে তার থেকে কয়েকখ ানি সরিয়ে রেখে চড়া দানে বিক্রি করে 'মুনাফা' অর্জনই তার মতলব, তখন পারিবারিক জীবনও যে এদের 'মুনাফা' - ভিত্তিক যুগপৎ কত অসার, অসাড় তারইকণ ছবি ফুটে ওঠে। সমাজজীবনের এই মূল্যবান 'একক' পরিবারের মধ্যেই যখন এই বিশ্বাসহীনতা, তখন এর অবদান কতটুকু এই সামাজিক ব্যবস্থায়? আবার এদেশে বর্তমানে কেমন করে সরকারি অফিস চলে এবং অফিসের উচ্চ পদাধিকারীদের চরিত্রভিত্তি কেমন, তারই এক নিখুঁত ব্যঙ্গচিত্র 'মা আম্রফলেষু' গল্পটি। সেখানে

অধস্তন পদাধিকারীর বাথমের আয়তন বড় বলে ঊর্ধবতম ডিরেক্টর অব অরগ্যানিজেনস্ পদত্যাগ করতে চেয়েছে। 'অফিসারের অফিসারে মন কষাকষি, কাজেই অফিসে কাজের বালাই নেই।...প্রতি ঘরে ছোট ছোট দল বেঁধে তারা জটলা করছে। কাজ যত না করবে, তত ওভারটাইম বাড়বে; সবাই খুব খুশি।' সাম্প্রতিক কর্মসংস্কৃতির এই চেহারাটিকেই সতীনাথ যেন তুলে ধরেছিলেন। এমনকি কর্মনিষ্ঠ নিয়মাবর্তী নীতিসম্পন্ন আদর্শবান অভিধায় যদি কোনো সরকারি অভিসার চিহ্নিত হন, তাহলে তা-ও যে কত অপেক্ষিক -- আপতিক, সতীনাথ তা-ই দেখালেন বড়সাহেব শ্রী শৈলেন মুখার্জীর চরিত্রে। বোম্বাই থেকে কলকাতা এসেছেন অফিস - পরিদর্শনে, তাই নীতিবোধের তাগিদে শ্রীআমাপ্পার ডিনারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা যায়নি, দুঃখের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু জানা গেল, সরকারি খরচে শ্যালিকার বিয়েতে আসবার উদ্দেশ্যেই তাঁর আকস্মিক অফিস - পরিদর্শনের অজুহাত। অনেক খুঁজে শ্রীআমাপ্পা যখন মুখার্জীসাহেবের শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত, তখন দেখলেন তিনি অন্য মানুষ, সত্য জানাজানি হওয়ায় কড়া মেজাজ উদ্বায়ী, সামাজিক সম্মানও ধূলিসাৎ। সতীনাথ দেখেছেন, দেখিয়েছেন পাঁচ টাকার পর আরো দশ টাকাদিলেএক্সাইজ - কমিশনারের খাস আর্দালির পচা ডিম তাজা হয়, নষ্ট দুর্ভ ভালো হয়ে যায়। সাব - ইনেপেক্টর, ইন্সপেক্টর সকলের মধ্যেই অসাধুতা আর ভণ্ডামি, যে দেশি মদের দোকান থেকে তাঁরা প্রতি মাসে বরাদ্দ 'প্রাপ্য' লাভ করেন, সেই দোকান থেকেই চোরাই গাঁজা আবিষ্কার করে পদোন্নতির পথ প্রশস্ত করেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থার অন্ধকারের উপর যেন আলো ফেলে এইসব গল্পগুলি।

তবে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বাত্মক বিকৃতি ও নৈতিক অধঃপতনের ব্যঙ্গ চিত্র 'পরকীয় - সন্ - ই - ল' ও 'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ'। 'পরকীয় - সন্ - ইন - ল' ৯ দেশ, শারদীয় ১৩৬৯) গল্পের সূচনায় লেখক অত্যন্ত সাবলীল ভাবেই বলেছেন।

''ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়া ছিল; পবন অনুকূল ছিল; কাজেই শ্রীসাহেবরাম, এম. এল. এ-কে Co-ordination বিভাগের উপমন্ত্রী হবার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হল না।'' মন্ত্রী হওয়ার জন্য বিদ্যে (ক্লাস এইট্!) সাহেবরামের ছিলই, শুধু পবন অনুকূল থাকলেই মন্ত্রীত্ব পাওয়া যায় অন্যান্য উমেদারদের বিড় থেকে --- সাহেবরাম পারল। শুধু দলের তত্তবিং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পথে দুটি বাধার সম্বন্ধে সাহেবরামকে সচেতন করে দিলেন একটি Parkinson's Law. অন্যটি Bottleneck । অতি সহজেই Parkinson's Law এর গূঢ়ার্থ বুঝে ফেললেন প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন উপমন্ত্রী---''ওটুকু বোঝাবার মতো ইংরেজির জ্ঞান আমার আছে। পরের (পরকী) সন-ইন্-ল কেন, নিজের জামাইকেও আমি চাকরি দেব না।'' অতি অল্পদিনেই সাহেবরামজী মন্ত্রীর 'প্রধান' কাজগুলি আরম্ভ করলেন, আয়ত্ত করলেন--- প্রায়ই সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন, ট্যুর করেন ও সভায় বক্তৃতা দেন। জিরানিয়া গ্রামে মুবিলের (পাট ধোয়ার জন্যে জলে নামলে জোঁকের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার 'ওষুধ') অকাল দেখা দিলে তিনি এরোপ্লেনে সেখানে 'মুবিল' পাঠানের সহজ পন্থ অবলম্বন করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন, 'মুবিল' উধাওকারীদের 'বম্বু' দেবেন। তিনি এই কঠিন Bottleneck ভাঙছেন। পরে 'বম্বু'সংক্রান্ত ভাষা ব্যবহার নিয়ে তাঁর বিদ্ধে শোরগোল হল, সাহেবরাম অনায়াসে বললেন, তিনি বলেছিলেন 'বম্বা' (জলের কল) দেবেন, সংবাদিকেরা ভুল শুনে থাকবেন। বাস্তবিক, মন্ত্রী কখনোই, 'ভুল' বলতে পারেন না, রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর এমন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সতীনাথ নিরাসক্ত ভাবেই করেছেন।

'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ' (আনন্দবাজার, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৬৯) সংস্কৃতির ধবজা উড়িয়ে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে অর্থসংগ্রহ করে। বিদেশে সাংস্কৃতিক ডেলিগেশন পাঠায় ইত্যাদি। এমনকি বন্যাত্রাণেও চাঁদা সংগ্রহে তাদের উদ্যোগ ত্রুটিহীন, শুধু দেকা যায়, গ্রামঞ্চল থেকে মন্ত্রীর হাতে টাকা আসতে সময় লাগে একবছর চার মাস। এই বিলম্বের যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে--- 'গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি দেরি হয় ফোটোগ্রাফার যোগাড় করতে; শহরে অপেক্ষা করতে হয় উপরওয়ালার ট্যুর প্রোগ্রামের; রাজধানীতে পছন্দমতো মন্ত্রী ছাড়াও কোনো কোনো সম্পাদকের খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করতে হয়।'' বন্যাবিপর্যস্ত অসহায় মানুষঘুলোকে উপবাসী রেখে মহাসমারোহে যে ত্রাণযজ্ঞ উদ্যাপিত হয় এ তারই এক কণ ছবি। সাহায্যের মুক্তমঞ্চে চলে হৃদয়হীন প্রহসন। সতীনাথ তাঁর নিষ্ঠুর আয়রণির আঘাত হানেন--- ''টাকাকে টেনে বড় করতে পারা শুধু গৃহিণীর পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়, জাতির পক্ষেও কৃতিত্বের পরিচায়ক। চার - পাঁচটি দানানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একই টাকার থলি হস্তান্তরিত করা, দানের অভ্যাস বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল। এ এক রকমের ড্রিল। এই ড্রিলের জিগির হচ্ছে--- 'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।'' গল্পের ক্লাইম্যাক্সে অপেক্ষা করে থাকে আরো

এক মর্মান্তিক পরিহাস। মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষার্থে তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ মহতী উদ্যোগ নিয়েছে, শতবার্ষিকীতে সংগৃহীত অর্থে "যা উদ্বৃত্ত আছে তার থেকে কয়েকটা স্কলারশিপ দেওয়া হবে। ঠিকই হয়েছে এর নাম হবে মধুসূদন স্কলারশিপ। হেয়ার কাটিং সেলুনের কর্মীদের থেকে বাছাই করে তাদের পাঠান হবে বিদেশে, জুলফি ও কেশসংস্কার সম্বন্ধে উচচতম জ্ঞান আহরণ করে আনবার জন্য।" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সতীনাথের আরো অনেক গল্প থেকে আমরা শুধু নির্বাচন করে নিয়েছি দেশকাল - নির্ভর তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প, চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্বনির্ভর গল্পগুলিতেও সমাজজীবনের যে চিহ্ন মুদ্রিত, এখানে সেগুলি অনালোচিত থেকে গেল। বস্তুত, আমরা দেখতে চেয়েছি, অন্তমুর্খী আত্মমগ্ন যে মানুষটি একদিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দেশসেবার সক্রিয় ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, আবার একদিন সেখান থেকে সরে দাঁড়ালেন --- সমকালীন পরিস্থিতি তাঁর মতো সংবেদী মানুষকে কোথায় আঘাত করেছিল যা তাঁকে বিমুখ করে তুলল, সেই সময়মন্থিত অভিজ্ঞতাটুকু। জাগরী, ঢোঁড়াই চরিত মানস, চিত্রগুপ্তের ফাইল সতীনাথের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একভাবে ধারণ করে আছে, সেখানে তাঁর মননের গভীরতা প্রাতীত। অন্যদিকে, তাঁর ছোটগল্পগুলিতে আঙ্গিকগত কোনো দুরূহতা নেই, ভাষাগত দূরূহতা নেই, স্যাটায়ারের নির্মমতা আছে, কৌতুকের প্রকাশ আছে, বেশিরভাগই হয়তো বর্ণনাধর্মী এবং তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা কিংবা বলা যায়তাঁর অভিজ্ঞতার সারাৎসারের শিল্পিত রূপায়ণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি যে ত্রৈলোক্যনাথ কিংবা পরশুরামের অনুগামী, ব্যঙ্গ কৌতুক তাঁরও প্রধান আয়ুধ। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সমাজসংস্কারের যে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাঁর একদা ছিল, এখানে যেন তিনি তা পরোক্ষে পালন করেছেন। সমকালীন জাতীয় দৈন্যের চিত্রণে তাঁর গল্পগুলি কখনো নক্শার কাছাকাছি পৌঁছেছে। জাতিহিতৈষা এবং তজ্জাত সমাজ - সংশোধনের আকাঙক্ষা তাঁর ছিল বলেই এই বিদ্রূপ - প্রবণতা তাঁর গল্পে বেশি প্রকাশ পেয়েছে, তবে লেখকের গভীর বেদনাও গোপন থাকেনি। এখানেই তাঁর শিল্পীসত্তার কালজয়িতা। দেশকালমন্থিত অভিজ্ঞতাকে তিনি বিস্তৃতি দিতে পেরেছিলেন, মানবপ্রীতিই তাঁকেসে ব্যপারে প্রাণিত করেছিল। দাদামশাই কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল প্রমুখর সান্নিধ্যেও এই মানসিকতার অন্যতম উৎস খুঁজে নেওয়া হয়তো ভুল নয়, তবে উচচকিত ক্ষোভ - ত্রোধ - নির্মম অট্টহাসির পরিবর্তে সতীনাথের গল্পের আবহে স্মিত কৌতুকই বিদ্যমান, কড়া বিদ্রূপও অনেক সংহতভাবে অভিব্যত্ত। শুধু 'চমক' দিয়ে গল্প শেষ করেননি সতীনাথ। তীক্ষ্নবী মনস্থিতা দিয়ে তাঁর সময়তাঁর সমাজকে যে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তারই আন্তরিক অভিজ্ঞান মুদ্রিত হয়ে রয়েছে তাঁর এই ধরনের গল্পগুলিতে। 'গণনায়ক' কিংবা 'চরণদাস এম. এল. এ' তো ভারতবর্ষের কোনো বিশেষ সময়ের গল্প শুধু নয়, লেখকের অভিজ্ঞতা এখানে কালকে স্পর্শ করে কালোত্তরে বাহিত হয়েছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com